দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

অভাব-অনটনের কারণে শিশুরা বিভিন্ন কাজকর্মে নিয়োজিত

মনিরামপুরের চালকিডাঙ্গা গ্রামে ৪০ ভাগ শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

মিজানুর রহমান তোতা ঃ চালকিডাঙ্গা গ্রামের ৪০ শতাংশ শিশু-কিশোর শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ৬০ শতাংশ স্কুলে আসে, যার ৩০ ভাগই খেয়ে না খেয়ে ও ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে ক্লাস করে। তার মধ্যে আবার ১৫ শতাংশ অনিয়মিত। গ্রামটি যশোর জেলার মনিরামপুর থানার। যশোর-কেশপুর সড়কের পাশেই চালকিডাঙ্গা গ্রাম। সেখানকার মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন ও চাকরিজীবী। ২০ শতাংশ দরিদ্র কৃষক। আর বাকী ৭৯ শতাংশই হচ্ছে রিক্সা, ভ্যান, ঠেলা গাড়ী চালক, হকার, ফেরিওয়ালা, দিনমজুরসহ অভাবী মানুষ।

শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত শিশু-কিশোররা পিতা ও ভাইয়ের সাথে কাজ করে। স্কুলে যাবার সামর্থ নেই। প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে দু'এক মাস গেলেও পরে আর সম্ভব হয় না। অভিভাবকরা কেন তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারলেন না, কেন শিশু-কিশোররা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হল তা দেখার কেউ নেই। নেই শৈশবে লেখা-পাড়ার আনন্দ জড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা। এর জন্য দায়ী কে? শিক্ষা প্রসারে সরকারের পাশাপাশি অনেক এনজিও দেশে কাজ করছে। তবুও দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে দৈন্যদশা বিরাজ করছে তারই স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি বেরিয়ে এসেছে চালকিডাঙ্গা বেসরকারী আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ঐ গ্রামের হালচালে।

অতি সম্প্রতি চালকিডাঙ্গা গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে যে করুণ অবস্থার বর্ণনা পেয়েছি তাতে নির্দিধায় বলা যায়, অর্থনৈতিক সংকট শিক্ষার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অবস্থানকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে। যা প্রতিটি সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। মনিরামপুর থানা সদরে যাবার আগে পাকা রাস্তা থেকে নেমে পশ্চিম বরাবর একটু কাঁচা রাস্তা গিয়ে এগুলেই দেখা যাবে চালকিডাঙ্গা রেজিস্টার্ড বেসরকারী আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ১৯৮৩ সালে স্থাপিত। আজো সরকারী হয়নি। যদিও বহু দেন দরবার চলেছে। স্কুলে ঢোকার পথেই ৩টি শিশুর সাথে কথা হল। বাড়ী তাদের চালকিডাঙ্গা গ্রামেই। তারা খড়ি পাতা কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। স্কুলে যায় না। তাদের নাম জাকির (৮), নাসিমা (৫) ও ফজর (৬)। খড়ি পাতা কুড়িয়ে তারা বাড়ী ফিরছিল। গ্রামে ঢুকছিল ভ্যানচালক তারিক নামে এক যুবক। সে বলল, অভাবের কারণে ওরা স্কুলে যেতে পারে না। বলল, 'কি খাবে সেই চিন্তায় বাঁচে না, তা স্কুলে যাবে কি করে?'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী আনোয়ার হোসেনের সাথে কথা বললাম। তার বাড়ী ঐ গ্রামেই। ১৬/১৭ বছর ধরে তিনি বিদ্যালয়টির হাল ধরে আছেন। এখন খুব কষ্ট হয়। যা ভাতা পান তাতে সংসার নির্বাহ করা হয় কঠিন। একই ধরনের কথা বললেন, ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল জব্বার, আলী আজম ও মোঃ বজলুর রহমান। তারা জানালেন, চালকিডাঙ্গা গ্রামের আবদুস সামাদ, আবদুস সালাম, আবুল কালাম, ইসলাম শেখসহ বহু মানুষ তাদের সন্তানাদির স্কুলে পাঠাতে পারে না। ক্লাস ফাইভের মেধাবী ছাত্র আকবর আলীর ছেলে তরিকুল স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। ক্লাস ওয়ানের ছাত্র শরিফুলও ছিল মেধাবী। তার পিতা দেনার দায়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। বন্ধ হয়ে গেছে শরিফুলের স্কুলে আসা।

স্কুলে আসা বহু কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীর সাথে কথা হল। ক্লাস ওয়ানের ছাত্র মেহেদী, পিতা হায়দার, সোলাইমান, পিতা নূর মোহাম্মদ, শাহিন, পিতা আবদুস সাত্তার, ছাত্রী জেসমিন ও আফরোজা, পিতা কমর আলী গাজী, শাহানারা, পিতা আবদুল মোতালেব, ক্লাস টুর ছাত্র বুলবুল, পিতা নূর মোহাম্মদ জানালো তারা না খেয়ে স্কুলে এসেছে। কথা বলার সময় ছিল বেলা ১২টা। বাড়ী ফিরবে বেলা ২টায়। তখন বাড়ী গিয়ে খেতে পারবে কিনা তা অরা বলতে পারেনি। আরও অনেকেই আধ পেটা পান্তা ভাত, মুড়ি কিংবা অন্য কিছু খেয়ে স্কুলে এসেছে। কোন স্কুল ড্রেস নেই। পরনের কাপড় দেখলেই বুঝা যায় যে, এক কাপড়েই অনেকে কাটিয়েছে দুই চারদিন। তাদের পিতা কেউ ভ্যান চালায়, মাঠে কাজ করে, কেউবা হকার করে। শিক্ষা উপকরণের অভাব আছে। সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রীর পায়ে জুতা স্যান্ডেল নেই। ওরা স্কুলে আসে খালি পায়ে। বিদ্যালয় সূত্র জানায়, বিদ্যালয়টিতে কাগজ কলমে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ৩ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা থাকলেও আড়াই শ'র মত ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত স্কুলে আসে। চালকিডাঙ্গা গ্রামে স্কুলে আসার মত সর্বমোট শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৫ শতাধিক। গ্রামের কয়েকজন ও শিক্ষকরা জানালেন, গ্রামের গা ঘেঁষে আছে কাকড়ীর বিল। প্রায় ২ হাজার একর জমি রয়েছে ঐ বিলে। দীর্ঘদিন ধরে পানি বদ্ধতায় ফসল হয় না কাকড়ীর বিলে। যার জন্য গ্রামটিতে অভাব জেঁকে বসেছে নিঃস্ব হয়েছে বহু কৃষক।

যশোর অফিস ঃ বিদ্যালয়ের পাশেই ওদের বাড়ী। অভাবের কারণে বিদ্যালয়ে যায় না। খড়ি ও পাতা কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। ছবিটি মনিরামপুরের চালকিডাঙ্গা গ্রাম থেকে তোলা হয়। –ইনকিলাব